BHARATI INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH & DEVELOPMENT (BIJMRD)

(Open Access Peer-Reviewed International Journal)

DOI Link : https://doi.org/10.70798/Bijmrd/03090030

Available Online: www.bijmrd.com|BIJMRD Volume: 3| Issue: 09| September 2025| e-ISSN: 2584-1890

ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান শান্তিনিকেতন পর্যটনে পট ও পটুয়া সমাজের ভূমিকা

Anamika Shil[1] & Samiran Mondal[2]

1. ICSSR Post-Doctoral Fellow.
2. Prof., IKS Lab Dept. of Physical Education & Sport Science, Vinaya Bhavana, Visva-Bharati, Santiniketan

বিমূর্তিকা (Abstract):

প্রাচীনকাল থেকেই ভারতীয় জ্ঞানচর্চার মধ্যে চিত্রকলা, নৃত্য ও গীত অন্যতম স্থান দখল করে আছে। তার মধ্যে চিত্রকলা, নৃত্যকলা ও সংগীতের সম্মিলিত সৃষ্টিকর্মের প্রয়াস হল পটচিত্র প্রদর্শনী। এই গবেষণাপত্রে পটচিত্রের ঐতিহাসিক উৎপত্তি ও বিবর্তন বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এটি একটি প্রাচীন শিল্পরীতি, যা পটুয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ঐতিহ্যবাহী অনুশীলন ও সৃষ্টিকর্মের দ্বারা প্রবাহিত হয়ে চলেছে। ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও আঞ্চলিক প্রভাব কীভাবে এই অনন্য শিল্পরূপকে গঠন করেছে, তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে, এবং এর ধর্মতাত্ত্বিক গুরুত্ব ও বিবিধ রূপান্তরের উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

শান্তিনিকেতন হল ইউনেস্কো ঘোষিত বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী একটি এলাকা (UNESCO World Heritage Site) হয়েছে। শান্তিনিকেতনের আশেপাশে কয়েকটি গ্রাম আছে যেখানে পটুয়া সম্প্রদায় বসবাস করেন। এইসব গ্রামে পটচিত্রকে ভিত্তি করে পর্যটনকেন্দ্র গড়ে তোলা গেলে, এই প্রাচীন শিল্পধারার পুনরুজ্জীবন ও প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। একই সঙ্গে, স্থানীয় শিল্পীদের জীবিকায় উন্নতি ঘটবে এবং গ্রামগুলির অর্থনৈতিক অবস্থারও উন্নতি হবে। এই উদ্যোগ পটচিত্রের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষায় এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হতে পারে।

মূলশব্দ: *পটুয়া, পটচিত্র, সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল, ঐতিহ্যবাহী শিল্পকলা, পর্যটন।*

ভূমিকা (Introduction):

এই গবেষণাটি Indian Knowledge System (IKS) এর লোকশিল্প এবং লোকসংস্কৃতি (Indigenous Art and Culture) ধারার অন্তর্গত। যেখানে পটচিত্র শিল্প একটি জীবন্ত ঐতিহ্য হিসেবে সামাজিক শিক্ষা, নৈতিক মূল্যবোধ ও পরিবেশ সচেতনতায় অবদান রাখে। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ (NEP 2020) তে ঐতিহ্যবাহী ও আঞ্চলিক জ্ঞানসম্পদকে (Indigenous knowledge) শিক্ষার মূল ধারায় অন্তর্ভুক্ত করে সংস্কৃতি সংরক্ষণ ও আত্মনির্ভরতা গড়ে তোলার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই গবেষণার মাধ্যমে পটুয়াদের সাংস্কৃতিক ও শিক্ষামূলক তাৎপর্য তুলে ধরা হয়েছে এবং তা পরিবেশ সহায়ক স্থিতিশীল উন্নয়নের (Sustainable Development) সঙ্গে যুক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

বঙ্গ সংস্কৃতির বৈচিত্র্যময় ধারা প্রাকৃতিক পরিবেশ, সামাজিক রূপান্তর ও শিল্প সংস্কৃতির আন্তঃসম্পর্কে গঠিত। বঙ্গের পটচিত্র ও পটুয়া সংস্কৃতি একটি বিচিত্র ও বহুমাত্রিক লোকশিল্প। বাংলার পট কেবল নান্দনিক নয় বরং সামাজিক, ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক বাস্তবতার প্রতিফলন; যেখানে আদিবাসী ঐতিহ্য, জাতিভিত্তিক পেশা, পরিচিতি সংকট এবং অভিযোজন প্রক্রিয়া একত্রে মিলেমিশে গেছে।

পটচিত্র একটি প্রাচীন শিল্পকলা। এই শিল্পকলার মধ্য দিয়ে পটুয়া সম্প্রদায়ের নান্দনিকতা ও শিল্প সত্তার বিকাশ ঘটেছে বহু প্রাচীনকাল থেকে। মনে করা হয় প্রাচীন গুহাচিত্র যেমন অজন্তা-ইলোরা, ভীমবেটকা প্রভৃতি এই পটচিত্রেরই আদিরূপ; কিন্তু তার কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না। যারা পটচিত্র অঙ্কন করেন তারাই পটুয়া নামে পরিচিত। বিভিন্ন প্রাচীন সাহিত্যিক নিদর্শনে পটচিত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়, যেমন- ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, হর্ষচরিত, মুদ্রারাক্ষস এবং বৌদ্ধ গ্রন্থ জাতক ও ললিতবিস্তার প্রভৃতিতে পটচিত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়।

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে ছয় ধরনের চিত্রশৈলীর উল্লেখ পাওয়া যায়, যা প্রমাণ করে যে প্রাচীন ধর্মীয় সাহিত্যে চিত্রকলাকে এক বিশেষ ঈশ্বরপ্রদত্ত দক্ষতা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এই সমস্ত তথ্য নির্দেশ করে যে, পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক ঘটনাবলীকে চিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করার জন্য শিল্পীরা ছিলেন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিছু শিল্পী ধর্মীয় বিষয়বস্তুর চিত্র আঁকতেন, আবার কেউ কেউ বাস্তব জীবনের দৃশ্য আঁকতেন।

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ অনুযায়ী বিশ্বকর্মা ও ঘৃতাচির ঔরসে সৃষ্ট নয় জন পুত্র হল- চিত্রকর, ভাস্কর, মালাকার, কাংসকার, তন্তুবায়, সূত্রধর, শঙ্খকার, কুম্ভকার ও স্বর্ণকার। কিন্তু পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের কিছু নির্দিষ্ট সামাজিক বিধি না মানার কারণে তাদের সমাজচ্যুত করা হয়। এই কারণেই পটুয়ারা প্রাচীনকাল থেকেই পটচিত্রের মাধ্যমে সমাজকে ন্যায়বোধ ও নৈতিক শিক্ষার বার্তা দিয়ে আসছেন (*Brahmavaivarta purana*, 2005)। "পট" শব্দটি এসেছে সংস্কৃত "পট্ট" থেকে যার অর্থ কাপড়। প্রাচীনকাল থেকে কাপড়ের উপর চিত্রাঙ্কনের রীতি প্রচলন ছিল যার থেকে পরবর্তীতে "পটুয়া" শব্দটির উৎপত্তি আর এই কাপড়ের ওপর অঙ্কিত চিত্রকলাকেই "পটচিত্র" বলা হয়।

গ্রামে গ্রামে ঘুরে পটুয়ারা গান গেয়ে পটচিত্র প্রদর্শন করেন এবং মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করেন। এই ঐতিহ্যবাহী প্রথাটি আজও বীরভূম জেলায় টিকে আছে। বর্তমানে প্রায় ২৫০০ পটুয়া বীরভূম জেলাতে বসবাস করে। ১৯০১ সালের আদমশুমারিতে তাদের সরকারি স্বীকৃতি দেওয়া হয়। ১৯১০ সালে ব্রিটিশ অফিসার L.S.S. O'Malley তাঁর Bengal District Gazetteers: Birbhum এ পটুয়াদের "প্রান্তিকজাতি" হিসাবে চিহ্নিত করেন *(O'Malley, 1910)*। এর অনেক পরে ভারত স্বাধীন হলে ১৯৫১ সালে তাদের সংস্কৃতি ও শিল্পভাবনাকে আনুষ্ঠানিকভাবে মান্যতা দিয়ে তাদেরকে শিল্পী বা কারিগর সম্প্রদায় হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

বীরভূম জেলা ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্রের মিলনস্থল এবং ভৌগোলিক দিক থেকেও বেশ গুরুত্বপূর্ণ এই অঞ্চল। ধর্মীয় প্রভাব থাকা সত্ত্বেও পটুয়ারা তাদের শৈল্পিক মনোভাব দিয়ে পটচিত্রকে সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের মাধ্যম হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। তাদের চিত্রকলায় ভারতীয় সনাতন ধর্মের পৌরাণিক চিত্র তথা ধর্মীয় বিশ্বাস, বিদেশী গল্পগাথা ও মানবিক চেতনা প্রাধান্য পেয়েছে, যা বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের কাছে সমানভাবে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। এখানকার পটুয়ারা মূলত নিমাই সন্ন্যাসী, বেহুলা-লক্ষিন্দর, কৃষ্ণলীলা, সিন্দবাদের কাহিনী, গোপালন বা গরুর পট, মনসামঙ্গল, যমপট ইত্যাদি পৌরাণিক বিষয়বস্তুর উপরে পট আঁকেন। এখানে মূলত জড়ানো পট আঁকা হয়। আবার চাহিদার ভিত্তিতে চৌকো পট তৈরি হয়।

পৌরাণিক বিষয় ছাড়াও পটুয়ারা সমসাময়িক বিষয়ের উপর পটচিত্র আঁকেন, যেমন-পালস পোলিও টিকাকরণ, নারী ভ্রূণ হত্যার প্রতিবাদ, স্যানিটেশন সচেতনতা, করোনাপট সরকারি উন্নয়ন প্রকল্প নিয়ে পট ইত্যাদি।

উদ্দেশ্য (Objective):

শান্তিনিকেতন পর্যটনে পট ও পটুয়া সমাজের ভূমিকা কতখানি তা অনুসন্ধান করাই এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য।

গবেষণা পদ্ধতি (Methodology):

গবেষক এখানে বিষয়টি বিশ্লেষণের জন্য বর্ণনামূলক সমীক্ষা পদ্ধতি (Descriptive Survey Method) ব্যবহার করেছেন । এই গবেষণায় human এবং non-human উভয় প্রকার নমুনা (Sample)। Human sample হিসেবে নেওয়া হয়েছে বীরভূম জেলার সিউড়ি মহকুমার ইটাগড়িয়া গ্রামের পাঁচটি পটুয়া পরিবার। অন্যদিকে, non-human sample হিসেবে পটও পটুয়া সংক্রান্ত বই, জার্নাল ও গবেষণাপত্র থেকে তথ্য নেওয়া হয়েছে। তথ্য সংগ্রহের (Data collection) জন্য সাক্ষাৎকার সূচি

(Interview Schedule) ব্যবহার করা হয়, যা শিল্পীদের সঙ্গে সরাসরি কথপোকথনের মাধ্যমে গুণগত তথ্য (Qualitative data) আহরণে সহায়ক হয়েছে।

সংগৃহীত তথ্যগুলিকে বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ (Content Analysis) এবং বিষয়গত বিশ্লেষণ (Thematic Analysis) পদ্ধতির মাধ্যমে ক্রমবিন্যস্ত করে বিশ্লেষণ করা হয়েছে, যাতে বিষয়গুলির মধ্যেকার প্রাপ্ত তথ্যগুলি থেকে তাদের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ব্যাখ্যা করা যায়।

তথ্য বিশ্লেষণ (Data Analysis):

প্রাচীনকাল থেকেই ভারতীয় শিল্পকলায় Visual Storytelling এর এক গৌরবময় ইতিহাস রয়েছে। আদিম মানব গুহার দেওয়ালে যেমন তাদের চাক্ষুষ ঘটনাবলী ও অভিজ্ঞতা চিত্রিত করেছেন তেমনই বর্তমান পট শিল্পকলাতেও তার প্রভাব দেখা যায়। আদিম মানুষেরা বিভিন্ন বন্যপ্রাণী যেমন-বাইসন, হরিণ প্রভৃতি অঙ্কন করতেন যার মাধ্যমে তাদের শৈল্পিক মনোভাব ব্যক্ত করতেন। অজন্তা-ইলোরার গুহাচিত্রে এরকম অনেক নিদর্শন পাওয়া যায়। যা প্রাচীন সভ্যতার শিল্পানুরাগের সাক্ষ্য বহন করে *(Singh, 2008)*।

পটচিত্র একটি প্রাচীন চিত্রকলা যা বাংলা ও ওড়িশায় শুরু হয়েছিল। পটচিত্রের আক্ষরিক অর্থ দাঁড়ায় কাপড়ের উপর আঁকা ছবি, প্রাচীনকালে যখন কোন রীতিসিদ্ধ শিল্পকলার অস্তিত্ব ছিল না তখন এই পটচিত্র শিল্পই ছিল বাংলার শিল্পকলার ঐতিহ্যের বাহক। বিষয় বৈচিত্র অনুসারে পটচিত্র কে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যেমন,-বাংলার কালীঘাট পট, হিন্দুপ্রাণ পট, যমপট, সাহেব পট, গাজী পীরের পট, সত্যপীরের পট, চকসুদন পট ইত্যাদি। এগুলো মূলত ধর্মীয় পটচিত্র এছাড়া রয়েছে ধর্মনিরপেক্ষ-সামাজিক পটচিত্র এখানে রয়েছে সামাজিক সমস্যা, রাজনৈতিক আন্দোলন এবং ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর ওপর আঁকা হয় যেমন-প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বন্যা, দুর্ভিক্ষ, স্বাধীনতা আন্দোলন, নারীর অধিকার, সামাজিক কুসংস্কার ইত্যাদি। আঞ্চলিক শৈলীর ভিত্তিতে যদি দেখি আরো কয়েক প্রকার পটচিত্র দেখা যায় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ওড়িশার পুরী পটচিত্র, ঝাড়খণ্ড ও বিহারের আদিবাসী স্ক্রলপেইন্টিং, রাজস্থানের ফড় (Phad) চিত্রকলা ইত্যাদি। এই সমস্ত পটচিত্র ও শৈলীতে ধর্মীয় কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক, রাজনৈতিক ও সংস্কৃতিক প্রতিফলন দেখা যায়। এই প্রাচীন শিল্পকলাটি গান, দৃশ্য ও গল্পকথনের মাধ্যমে লোককথা, পুরাণ ও ঐতিহাসিক ঘটনাবলীকে সংরক্ষণ করে চলেছে।

পটুয়ারা হলো যাযাবর শ্রেণির গল্প কথক। এই লোকগোষ্ঠীর পেশা বংশানুক্রমে নিজেদের বিশেষ শিল্প রীতিতে পট অঙ্কন করা, প্রদর্শন করা এবং তা বিক্রয় করা। অনেকটা মধ্যযুগীয় চারণ কবিদের মতো। পটুয়ারা বিভিন্ন পদবীতে বিভক্ত, যেমন-চিত্রকর, বেদিয়া, মাল, পটুয়া, পতিদার ইত্যাদি।

অনেকের ধারনা সেন শাসনের অবসানের পর এবং মুসলিম শাসনের সূচনাকালে এরা ইসলাম ধর্মের সংস্পর্শে আসেন। আত্মরক্ষার জন্য বা সামাজিক সুযোগ সুবিধা ভোগ করার উদ্দেশ্যে এরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। পটুয়াদের মধ্যে হিন্দু ও মুসলিম দুই সম্প্রদায়ই রয়েছে। বেশিরভাগ পটুয়ারা ইসলাম ধর্মাবলম্বী হলেও হিন্দু আচার-আচরণ পালন করে থাকেন, যেমন-নবান্ন, গরুর পরব প্রভৃতি। এখানে আমরা দেখতে পাই পটুয়ারা বেশিরভাগ হিন্দু গ্রামের পাশেই বসবাস করে। আবার মুসলিমদের মতন রোজা রাখেন, ঈদ পালন করেন, নামাজ পড়েন। পটুয়াদের সাথে মুসলিম সম্প্রদায়ের বিয়ে হয় না তারা নিজেদের জাতিতে বিবাহ করেন। তবে, ধর্মীয় পার্থক্য সত্ত্বেও, তাঁদের শিল্পকর্মের দক্ষতা অপরিবর্তিত থেকেছে *(Mazumdar,2015)*।

বীরভূম জেলার বিভিন্ন জায়গায় পটুয়াদের সন্ধান মেলে। যেমন- সিউড়ি ব্লকের অন্তর্গত ইটাগড়িয়া গ্রাম, লাভপুর থানার লাভপুর ও দাঁড়কা গ্রামে পটুয়াদের বসতি দেখতে পাওয়া যায়। এছাড়াও ময়ূরেশ্বর থানার ষাটপশলা, শিবগ্রাম মালঞ্চ, সুপুর, বল্লভপুরেও এদের বসতি রয়েছে। কোটাশুর, নানুর, তারাপীঠ, চন্দ্রপুর এলাকাতেও পটুয়া সম্প্রদায়ের দেখা মেলে। রামপুরহাট থানার অন্তর্গত বামুনিয়া চাঁদপুর প্রভৃতি এলাকাতেও পটুয়ারা রয়েছেন। আবার দুবরাজপুর থানার অন্তর্গত পালায়াড়াও কুমিরদহ অঞ্চলে পটুয়া সম্প্রদায়ের লোকজন বসবাস করেন এছাড়াও মল্লারপুর, নলহাটি, মুরারাই ইত্যাদি অঞ্চল জুড়ে বিক্ষিপ্তভাবে পটুয়ারা বসবাস করেন।

তারা পটচিত্র আঁকার সঙ্গে সঙ্গে লোকগান, পাঁচালী, ব্রতকথা সাপুড়ে বাঁশির সুরের সঙ্গে গান গেয়ে তাদের শিল্প পরিবেশন করে থাকে। এই পটুয়া সম্প্রদায়ের আদি পেশা ছিল সাপ খেলা দেখানো, এখনো কেউ কেউ যুক্ত আছেন এই পেশার সঙ্গে। পূর্ব ভারতে বিস্তৃত অঞ্চলে এবং বাংলাদেশেও বেদিয়া সম্প্রদায়ের লোকজন ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। যারা নিজেদের সঙ্গে ডমরু, ডুগডুগি ও বাঁশির মতো বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করতেন। বীরভূম মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে এখন বিলুপ্তির পথে কারণ জীবন ও জীবিকার তাগিদে তাদের পেশার পরিবর্তন ঘটেছে। ক্রমশ তাদের সঙ্গীত বিলুপ্তির পথে। জীবিকা নির্বাহের জন্য তারা ক্রমশ পটচিত্র অঙ্কন ও প্রদর্শন এর দিকে ঝোঁকেন। বিভিন্ন ধরনের পটাচিত্র আমরা দেখতে পাই যেমন জড়ানো পট, চৌকো পট যাতে পুরাণকাহিনী, সামাজিক বিষয়বস্তু, ধর্মীয় কাহিনী, লোককথা ও ধর্মনিরপেক্ষ বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা হয়ে থাকে।

শান্তিনিকেতনের নিকটবর্তী গ্রামগুলি যেমন ইটাগড়িয়া, পুরন্দরপুর, ষাটপশলা, জুনিদপুর, দাঁড়কা, বাগডোলা ও কুসুমযাত্রা এই সমস্ত গ্রামগুলিতে পটচিত্র আজও বেঁচে আছে। এগুলোর উপর ভিত্তি করে যদি পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলা যায় তাহলে এই মৃতপ্রায় সংস্কৃতি ও শিল্পরীতিকে পুনরুজ্জীবিত করা যাবে। স্থানীয় শিল্পীদের জীবিকা বাড়বে এবং অর্থনীতিরও উন্নয়ন হবে। এই পটচিত্রগুলি শান্তিনিকেতনের নিকটবর্তী আমার কুটির, বিশ্ববাংলা হাটে বিক্রি হয় যা বাংলার এই বিলুপ্তপ্রায় ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখছে। বর্তমানে এর প্রতি মানুষের আগ্রহ অনেকটাই কমে গেছে ফলে এই শিল্প প্রায় বিলুপ্তির পথে, ফলে তারা পেশা পরিবর্তন করতে একপ্রকার বাধ্য হচ্ছে। তারা বেশিরভাগই কাপড়ে রং ও ছবি আঁকার কাজ, রাজমিস্ত্রির কাজ, এবং পশু চিকিৎসকের কাজ করে থাকেন।

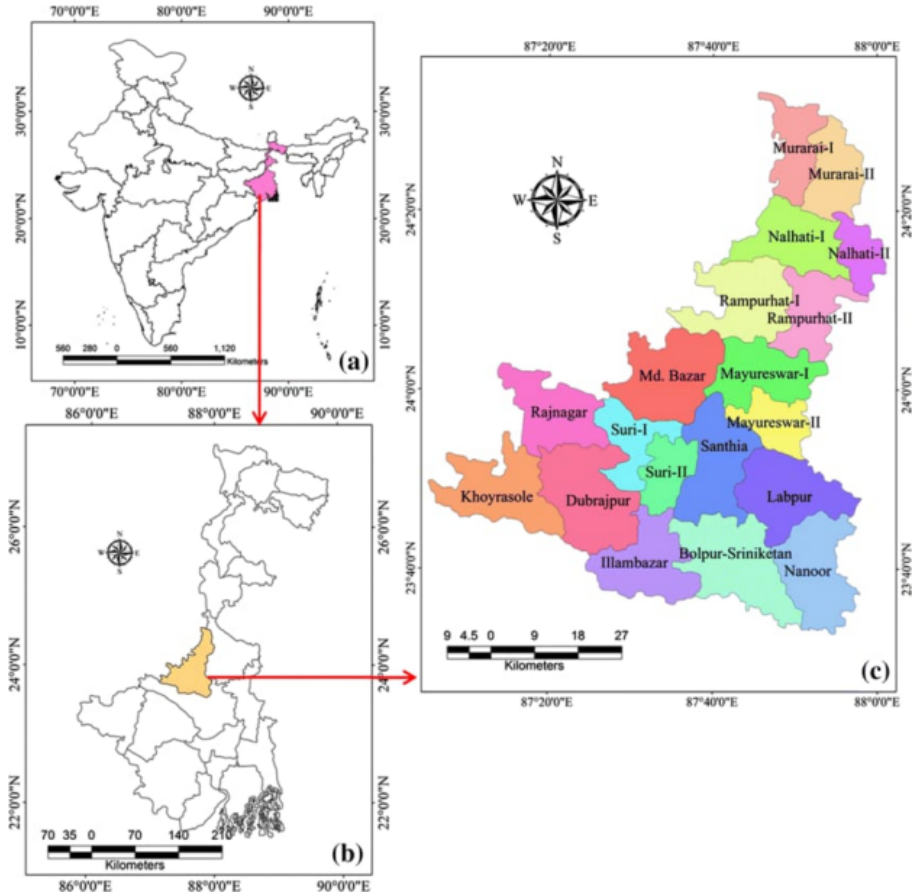

Birbhum Map

গবেষক সিউড়ি ১নং ব্লকের অন্তর্গত ইটাগড়িয়া গ্রামটিতে ক্ষেত্র সমীক্ষা (Field survey) করেছেন। সেখান থেকে প্রাপ্ত তথ্য সংগ্রহ করে তার নির্যাসটুকু তুলে ধরেছেন। ইটাগড়িয়া গ্রামটিতে প্রায় ৭০ টি পটুয়া পরিবার বসবাস করে। তার মধ্যে মাত্র ১০ টি পরিবার পটচিত্রের পেশার সঙ্গে যুক্ত। বাকি পরিবার জীবিকার তাগিদে এই পেশা ত্যাগ করে অন্য পেশার সাথে যুক্ত

হয়েছেন। কেউ দিনমজুরি করেন, কেউবা চাষবাস করেন। বর্তমান প্রজন্ম পড়াশোনা করে শিক্ষিত হয়ে কেউ কেউ সরকারি চাকরিও করছেন।

গ্রামটিতে যে কটি পরিবার পটের গানের সঙ্গে যুক্ত তারা সাধারণত যেসব পালা গেয়ে থাকেন; সেগুলি হল- নিমাই সন্ন্যাসী, গরুরপট, শিবের শঙ্খপড়া, সিন্দবাদ, মনসামঙ্গল, যমপট ইত্যাদি। বীরভূমের পটচিত্রের একটি বিশেষত্ব হল প্রতিটা পটের শেষে যমপট জুড়ে দেওয়া হয়। সেখানে যমরাজ, ভূত-প্রেত, মৃত্যু পরবর্তী পাপের শাস্তি সহ যমালয় ও নরকের জীবন্ত প্রতিচ্ছবি ফুটিয়ে তোলা হয়। এর মাধ্যমে তারা জনগণকে বোঝাতে চান পাপী ও অন্যায়কারীদের যমরাজ ক্ষমা করবেন না, যাতে প্রত্যেকে পরকালের কথা চিন্তা করে মানুষজন পাপাচার থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখে এই উদ্দেশ্যেই।

তবে কালের প্রবাহে তাদের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার বেশ অবনতি হয়েছে। মানুষের চাহিদা কমেছে ফলে তাদের এই প্রথাও প্রায়ই বিলুপ্তির পথে। তবে বর্তমান প্রযুক্তির ডিজিটাল যুগে এবং সরকারি প্রতিষ্ঠায় সামান্য কিছুহলেও মানুষের আগ্রহ পুনরায় বাড়তে দেখা যাচ্ছে। আশা করা যায় এইভাবেই আবার এর পুনরুজ্জীবন ঘটবে।

ফলাফল এবং অনুসন্ধান (Result and Finding):

১৯৫৪ সালে শান্তিনিকেতনের পৃথ্বীশ নিয়োগী, সুখলতা রাও ও শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পটচিত্র কে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরে পটচিত্র ও পটুয়াদের বিশ্বাসনে স্বীকৃতি এনে দেন। তাদের উদ্যোগে বিভিন্ন প্রদর্শনীতে পটচিত্র প্রদর্শিত হয়, তবুও আর্থিক অনিশ্চয়তায় পটুয়াদের বাধার সম্মুখীন হতে হয় বারংবার। পটুয়ারা কেবল মাত্র চিত্রশিল্পী নয় তারা গল্পকার ও সংগীত পরিবেশক। গ্রামে গ্রামে ঘুরে তারা পটচিত্র প্রদর্শন এবং সংগীত পরিবেশন করেন। এর মাধ্যমে ধর্মীয় বিশ্বাস, নৈতিক মূল্যবোধ, পৌরাণিক কাহিনী, সামাজিক বার্তা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেন। এই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বীরভূম মেদিনীপুর ও কালীঘাটের মতো অঞ্চলে সমৃদ্ধ ছিল। পটচিত্র সাংস্কৃতিক ইতিহাস সংরক্ষণের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম বলা যায়। কিন্তু পৃষ্ঠপোষকতার অভাব এবং সামাজিক পরিবর্তনের কারণে অনেক পটুয়া এখন বিকল্প জীবিকা খুঁজতে বাধ্য হচ্ছেন। যার ফলে এই প্রাচীন শিল্পের অস্তিত্ব অনেকটাই ম্লান হয়ে যাচ্ছে।

বর্তমানে পটচিত্রের ওপর সংকটের ছায়া বিদ্যমান, জনপ্রিয়তার অবক্ষয় ও আর্থিক দুরবস্থায় জর্জরিত এই প্রাচীন শিল্পকলা। অবলুপ্তির হাত থেকে বাঁচাতে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরী:

১. সরকার ও এনজিওর সহায়তা:

সরকারি ও বেসরকারি সংগঠনগুলোর অর্থায়ন ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচি শিল্পীদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে, জীবিকা রক্ষায় এবং নতুন প্রজন্মকে এই পেশায় আগ্রহী করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। শিল্প প্রদর্শনী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন জনসচেতনতা গড়ে তুলতে পারে, এর ফলে বাজারে পটচিত্রের চাহিদা তৈরি হবে। এই উদ্যোগগুলো শিল্পটির টিকে থাকাতে ও বিকাশে অপরিহার্য ভূমিকা পালন করবে।

২. পর্যটন ও অনলাইন প্রচার:

পর্যটন ও ডিজিটাল মাধ্যমে প্রচার পটচিত্রের লোভ্যতা ও বাজার সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। হস্তশিল্প মেলা ও অনলাইন প্ল্যাটফর্মে পটচিত্র বিক্রির মাধ্যমে শিল্পীরা বৃহত্তর দর্শকের কাছে পৌঁছাতে পারেন ও বিক্রির সুযোগ পান। কর্মশালা, পর্যটন নির্দেশিকা এবং গল্পকথন (Storytelling session) এর মাধ্যমে এর শিক্ষামূলক ও সাংস্কৃতিক দিকগুলি পর্যটক ও শিল্পানুরাগীদের কাছে আকর্ষণীয়ভাবে তুলে ধরতে হবে। এর ফলে শিল্পীদের আয় বৃদ্ধি হতে পারে এবং ক্ষয়িষ্ণু ঐতিহ্যের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাও জাগ্রত হবে।

৩. আধুনিক ডিজাইনে পটচিত্রের সংযুক্তি:

আধুনিক শিল্পে পটচিত্রের সংযুক্তি এই শিল্পকে নতুনভাবে আকর্ষণীয় করে তুলতে পারে। ফ্যাশন, গৃহসজ্জা ও বাণিজ্যিক শিল্পে পটচিত্র মোটিফ ব্যবহার করলে একদিকে যেমন গ্রাহকদের আগ্রহ বৃদ্ধি পায়, অন্যদিকে এর ঐতিহ্যবাহী গুণগতমানও রক্ষা পায়। এর ফলে পটচিত্রকে নতুন আঙ্গিকে উপস্থাপন করা যায়।

এই অংশে আলোচনা করা হয়েছে কীভাবে পটুয়া সম্প্রদায় বর্তমান সময়ে সংগ্রাম করছে এবং পটচিত্র সংরক্ষণের গুরুত্ব কতখানি।

সরকারি উদ্যোগে পটুয়ারা প্রায় কোন সহায়তা পায়না বললেই চলে। যদিও কিছু প্রতিষ্ঠান প্রদর্শনী (Gallery) ও শিল্প মেলার (Trade fair) মাধ্যমে এই বিলুপ্তপ্রায় ঐতিহ্যকে পুনররুজ্জীবিত করার চেষ্টা করছেন। তবে এই প্রচেষ্টা যথেষ্ট নয়, পেশাগত পটশিল্পীদের সংখ্যা ক্রমশ হ্রাস পেয়েছে। তারা অনেকেই বংশগত পেশা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছেন।

পটচিত্র শুধু একটি প্রাচীন শিল্পকলা নয়, বরং এটি সমাজ, ধর্ম এবং ইতিহাসের প্রতিফলন। এটি গল্পকথনের মাধ্যমে মৌখিকভাবে ঐতিহ্য সংরক্ষণে, ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা প্রচারে, এবং ঐতিহাসিক ঘটনা ও সামাজিক পরিবর্তনের নথিপত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। পটুয়ারা শুধু চিত্রকরই ছিলেন না, তারা ছিলেন গল্পকথক, সংগীতশিল্পী এবং নৈতিক শিক্ষাদানকারী, যারা মানুষকে সাংস্কৃতিক শিকড়ের সাথে সংযোগ স্থাপনে সহায়তা করেছিলেন। ঐতিহ্যগতভাবে, পটচিত্রে প্রধানত ধর্মীয় মহাকাব্য যেমন- রামায়ণ ও মহাভারত, দেবতাদের যেমন- কৃষ্ণ, কালী, দুর্গা, এবং চৈতন্য মহাপ্রভু, এবং উপজাতীয় মিথ ও লোককাহিনীগুলি অঙ্কন করা হত। তবে, সময়ের সাথে সাথে এর মূলভাব পরিবর্তিত হয়েছে। আধুনিক সময়ে, পটচিত্রের মাধ্যমে সামাজিক ঘটনাবলী যেমন সাক্ষরতা, মহিলাদের অধিকার, এবং পরিবার পরিকল্পনা; রাজনৈতিক ঘটনা, স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং স্বাধীনতা আন্দোলন; এবং পরিবেশগত বিষয় যেমন বনসৃজন এবং দূষণ সচেতনতার প্রচার করা হয়। এই পরিবর্তনের পরেও, পটচিত্রের চাহিদা হ্রাস পেয়েছে, যার ফলে পটুয়া সম্প্রদায় অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছে। যদি এই প্রচেষ্টা বাস্তবায়িত না হয়, তবে পটচিত্র বিলুপ্ত হয়ে যাবে এবং বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ চিরতরে হারিয়ে যাবে।

উপসংহার (Conclusion):

বীরভূমের পটুয়ারা শতাব্দী প্রাচীন একটি ঐতিহ্যের রক্ষক, তবুও তাদের এই কর্ম এখন টিকে আছে। এই শিল্পটি এখন বিলুপ্তির মাঝামাঝি অবস্থানে রয়েছে। পটচিত্র, যা একসময় গল্পকথন এবং সাংস্কৃতিক প্রকাশের একটি প্রাণবন্ত মাধ্যম ছিল। যা এখন আধুনিকীকরণ ও অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকতার কারনে ঝুঁকির সম্মুখীন। এই অবনতি শুধু পটুয়া সম্প্রদায়ের জীবিকা নয়, বাংলার ঐতিহ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশকেও বিপন্নতার মুখে ফেলছে। এই শিল্পরূপটি পুনরুজ্জীবিত করতে নানাবিধ বিচার বিবেচনা ও দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োজন। সরকারী এবং বেসরকারি উদ্যোগগুলোকে পটচিত্র শিল্পীদের জন্য আর্থিক সহায়তা, প্রশিক্ষণ কর্মসূচি এবং প্রদর্শনীর সুযোগ প্রদান করতে হবে। পর্যটন একটি শক্তিশালী মাধ্যম হতে পারে এই শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য, শান্তিনিকেতনের নিকটবর্তী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র এবং কারুশিল্প গ্রামগুলি স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যটকদের আকৃষ্ট করতে পারে। তাছাড়া, পটচিত্রকে আধুনিক নকশা হিসাবে ফ্যাশন, গৃহসজ্জা এবং ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সংযুক্ত করে দর্শক ও ক্রেতাদের আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারলে এর মৌলিকতাও রক্ষা পায়। পটচিত্রের ঐতিহাসিক এবং শৈল্পিক গুরুত্ব স্বীকার করে, শিল্পীদের সহায়তা করা এবং তাদের কাজ জাতীয় এবং বিশ্বের দরবারে প্রচার করতে হবে। এতে আমরা নিশ্চিত করতে পারি যে এই চিরকালীন

ঐতিহ্যটি টিকে থাকবে। এ ধরনের প্রচেষ্টা ছাড়া, পটচিত্র একটি মুছে যাওয়া পুরাকীর্তি হয়ে যেতে পারে, যা একসময়কার সমৃদ্ধ শিল্প ঐতিহ্যের কেবল জীবাশ্ম রেখে যাবে। পট শিল্পের ভবিষ্যত আমাদের হাতে, এটি আমাদের দায়িত্ব যে আমরা এই অমূল্য ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ করে ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য বাঁচিয়ে রাখতে পারি।

তথ্যসূত্র (References):

- Bhattacharya, A. (1964). *Bangiyo Loko-Sangeet Ratnakosh*. Paschimbanga LokoSanskriti Gobeshona Kendra. P. 1041.
- Brahmavaivarta Purana. (2005). (S. Sharma, Trans.). Motilal Banarsidass. (Original work published ca. 10th century CE). https://archive.org/details/BrahmavaivartaPurana
- Chattopadhyay, K. (1960). *Indian Scroll Paintings*. Publications Division, Ministry of Information and Broadcasting, Government of India. Pp. 45-52, 53-58.
- Das, K., & Pal, S. (Eds.). (2022). *Raṛh Katha – Paṭa Saṅkhyā* 1429 (Vol. 20, Annual Edition, July 2022). Raṛh Katha. ISSN 2348-943X. Pp. 401-421.
- Manna, S. K. (2024). *Banglar Patachitra, Patua Sangeet, Patua Samaj O Lokosanskriti Vijnana* (2nd ed.). Pharma K.L.M. Pvt. Ltd. P. 35.
- Mazumdar, G. (2015). *Birbhumer Itihas Prasange* (10th ed., rev. & updated). Sahityasree. Pp. 38-39.
- Mokashi, A. (2021, January 29). *Pattachitra: The heritage art of Odisha.* Retrieved from https://www.deccanherald.com/specials/pattachitra-the-heritage-art-of-odisha-944849.html
- Mukherjee, A. (2020). *Kalighat paintings: A national artefact, the folk and counter representation in the making of modern art in Bengal*. Chitrolekha Journal on Art and Design. Pp. 52-58.
- O'Malley, L. S. S. (1910). *Bengal district gazetteers: Birbhum*. Bengal Secretariat Book Depot. https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.105747
- Singh, K. S. (Ed.). (2008). *Tribal arts and crafts of Bihar and Jharkhand.* Anthropological Survey of India. pp. 105–112.
- Singh, U. (2008). *A history of ancient and early medieval India: From the Stone Age to the 12th century*. Pearson Education India. pp. 78–81, 626–628.
- Reddy, K. R., Barui, R., & Biswas, S. (2024). Kalighat paintings as a medium of communication in colonized Bengal province. *International Journal of English Learning & Teaching Skills*, 3(4), Article 10. https://research.smartsociety.org/ijelts/vol3/iss4/10/
- Junik-Łuniewska, M. (2019). Oral traditions and folk art: A case of Phad paintings with emphasis on 'Pabuji Ki Phad', and commercialisation of crafts. *ResearchGate*. https://www.researchgate.net/publication/371317063_Oral_Traditions_and_Folk_Art_A_Case_of_Phad_Paintings_with_Emphasis_on_'Pabuji_Ki_Phad'_and_Commercialisation_of_Crafts

Citation: **Shil. A. &Mondal. S.,** (2025) "ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান শান্তিনিকেতন পর্যটনে পট ও পটুয়া সমাজের ভূমিকা", *Bharati International Journal of Multidisciplinary Research & Development (BIJMRD)*, Vol-3, Issue-09, September-2025.